কুপির আলো

সমীর চৌধুরী

ঘুনিতে বাড়ি ছিল ওদের। বাড়ি মানে অবশ্য নিজের বাড়ি নয়, ভাড়াও নয়। লাউহাটি রোডের ওপর কালিপার্কের ভবেশ গোলদারের বিরাট বাড়ি, লরির ব্যবসা। এছাড়াও মুদির দোকান, লটারির দোকান একটা বাগুইআটির ওদিকে --- তারই অনেক আগের কেনা, প্রায় দশ বিঘে দেওয়াল - ঘেরা জমির ভেতর একটা ছোটো অ্যাসবেটসের ঘর, বারান্দা, রান্না করার একটু জায়গা, পায়খানা বাথম -- ভাড়া দিতে হবে না, গোলদারও বেতন - টেতন কিছু দিতে পারবে না -- এই চুক্তিতে ছিল ওরা। বাউন্ডারির ভেতরেই চাষের কাজ চালাতনগেন। নানারকম সবজি ছাড়া ধানচাষও করেছে সে প্রথম প্রথম। এছাড়া বাউন্ডারি বরাবর নারকোল সুপারি গাছ ছিল অনেকগুলো। নগেনের সুবিধে গোলদারের অনেক সম্পত্তি থাকলেও খাবার লোক তেমন ছিল না। তাছাড়া বউটা বাতের গি। সে কী করছে না করছে তাই নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর তেমন কোনো লোক ছিল না। ফলে জীবনটা এমন সহজ ভাবেই চলে যাবে বলে ধরে নিয়েছিলসে।

নগেন মণ্ডলের কাছে এখন সেসব স্বপ্নের মতোই মনে হয়। মাথার ওপর বিশাল একটা আকাশ ছাদের মতো পাহারা দিত তাদের। রাত হলে তারার দল ঝুঁকে পড়ে তার ছোট্ট ঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকত। শেয়াল ডাকত ধুপির বিলের ওপার থেকে। ধুপির বিলের পাড় ধরে হেঁটে গেলে একটা নিরালা দ্বীপের মতো পড়ত, সেখানে নাকি কোনো একসময় গুলবাগও ছিল। সবই এখন গল্পের মতো মনে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে কুপির কেঁপে কেঁপে ওঠা আলোয়, শীতের শুনশান রাতে, সেই পুরোনো দৃশ্যগুলোই নগেনের মনের ভেতর ভেসে ওঠে।

খুব বেশি হলে আটটা বাজে, অথচ এখনই অনেক রাত মনে হচ্ছে। মিনিটপাঁচেক পুবমুখো হাঁটলেই বিটি রোড। ডানদিকেডানলপ, বাঁদিকে রথতলা মোড়। পশ্চিমে দক্ষিণেশ্বের, পূর্ব দিকে বেলঘরিয়া। অথচ এই গলিটার ভেতরে রাত আটটাতেই সব শুনশান। লাইটপোস্টের আলোগুলোও কেমন মিয়ানো। নগেন শুনেছে, বছর দশেক আগেও লোক সন্ধের পর এদিকটা মাড়াত না। যত সব মাতাল, খেউড়বাজদের ভিড়। গলির মুখটায় দাঁড়িয়ে থাকে ভ্যান রিকশা, বালি লরি; অটো সারাইয়ের দোকান রয়েছে, রয়েছে ম্যাটাডরের স্টান্ড। কিন্তু দশ বছরের ভেতর অনেকগুলো ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেছে গলির ভেতরে। ফলে পুরোনো ছবিটা একটু হলেও বদলেছে। গলির মোড়ে এখন রাত হলে মাতালদের অতটা জটলা আর দেখা যায় না। কিন্তু তবুও গলিপথটা এত শুনশান যে, রাত আটটাতেই মনে হয় অনেক রাত।

কুপির কেঁপে কেঁপে ওঠা আলো ঘুনির বাড়িটার কথা সবচেয়ে বেশি মনে করিয়ে দেয় তাকে। মাঝখানের অনেক সব ঘটনা আর ছবিকে মুছে ফেলে সে যেন ফিরে যায় ঘুনির সেই বাড়িতে। হাতিয়াড়া, মেঠোপাড়া হয়ে মাঠের মধ্যে সোজা চলে গেলে চাঁদ যেসব রাতের মাঠ পাহারা দেয়, কেমন যেন গা ছমছমে দেখাত তাদের দেয়ালঘেরা ছোট্ট ঘরটা। মেঠোপাড়া আর ঘুনির মধ্যবর্তী মাঠটা এক সময় ছিল শুধুমাত্র চাষেরই জায়গা। অন্তত যখন থেকে দেখছে সে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু চাষবাস হলেও, চাষিরা অনেকেই চাষবাস ছেড়ে দিয়ে ইতিউতি নানারকম কাজে চলে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। বাড়ি উঠছিল মাঠের মধ্যে একটা একটা করে। মাঝখানে কোথায় যেন কোন দেশে দাঙ্গা হল হিন্দু - মুসলমানে আর অমনি হাতিয়াড়া মেঠোপাড়ায় এসে একগাদা বিরাহি মুসলমান বস্তি তৈরি করল। এরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এমন একটা উগ্রতা যার সঙ্গে এর আগে বাঙালি মুসলমান পরিবারের তেমন পরিচয় ছিল না। বাঙালি মুসলমানরা নাকি তেমন মুসলমানই নয়। তাই

কালীপুজোর রাতের বাজি পটকার শব্দ শুনেই বিহারি মুসলমানরা বড়ো বড়ো লাঠি ছুরি নিয়ে বাড়ির উঠোনে পায়চারি করে নয়তো বাড়ির সামনে দল বেঁধে জটলা করে। এছাড়া মানিকতলা, বেলেঘাটা, রাজাবাজার বা আরও কোথাও কে াথাও যেসব উচ্ছেদ - কাজ হচ্ছিল, কিছু কিছু লোক সেখান থেকেও চলে আসছিল এগিয়ে। ফলে চাষবাসহীন মাঠটা যেমন একদিকে হয়ে উঠেছিল ভাগাড় অন্যদিকে নানা জাতি ও ধর্মের মিশ্র বসতির এক জটিল সমাবেশ। মেঠোপাড়ার পূর্বদিকের মাঠে অবশ্য বস্তি কম। কোথা থেকে থেকে সব গমরা, কুকুর মরা মাঠে নিয়ে এসে ফেলে যেত কারা। শকুন আর কুকুরগুলো সেই মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করত। বর্ষা নামলে পুরো মাঠটাযখন জলে ভরে যেত, তখন তার আবার অন্য র ূপ। সারা রাজ্যের যত জল সব এই ধুপির বিল,নোয়াই খাল আর বাগজোলা দিয়ে বিদ্যেধরীতে গিয়ে পড়ে। ধুপির বিলে লক গেট আছে যাত্রাগাছির ওদিকে। বর্ষায় সেই লকগেট বন্ধহলেই মাঠের চেহারা হত বিশাল জলাশয়ের। একটা ডোঙা মতো তৈরি করে নিতে হয়েছিল নগেনকে। সেই ডোঙাতে করে তারা মাঠ পারাপার হত। জলে জলময় মাঠ। কোথাও বুক সমান তো কোথাও আবার ডুবজল তার। পেলটু আর মিনুর মা অতটা না হলে ছেলেমেয়ে দুটো ডোঙা চালাতে ভারি ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল

আবছা আলো অন্ধকারে বিটি রোডে একটা লোক আসছে দেখে, নগেনের সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে মুহূর্তে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটাকে জরিপ করার চেষ্টা করে। দেখে লোকটার হাতে ব্যাগটাগ আছে কি না। গলির ভেতরের দিকের বেশিরভাগ বাড়িরই হয়স্কুটার না হয় মাতি আছে। ওরা কোথা থেকে বাজার করে, কী খায় জানে না নগেন। তবে মনে হয় ডানলপ সুপার মার্কেট থেকেই বাজার করে। সকালের দিকে ভ্যানগাড়ি থেকেও ...। তবে এই নিয়ে সাতদিন হল সে এখ ানে বসছে তার নানারকম শাকসবজি, লঙ্কা, আলু ইত্যাদি নিয়ে, কিন্তু গাড়িওলা বাবুরা কেউই তার দিকে ফিরে তাক ায়নি। খরিদ্দার যা পেয়েছে, সে সবই হেটুরে গরিব মানুষ, নিম্নবিত্তের লোকজন, বেজায় দরদাম করে, হয়তো পঞ্চাশ গ্র াম কাঁচালঙ্কা, কি দুশো গ্রাম ট্যাঁড়শ কিনেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে, ওরাথাকে বেশ কিছুটা দূরের দিকে। দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি না হলেও, এখান থেকে অনেকটা দূর। ওপাশটা যতটা দেখেছে নগেন, খাটাল, ছোটো ছোটো টা লির বাড়ির লোক সব। পাকাবাড়িও আছে, তবে সেগুলোর ভাঙাচোরা হতশ্রী চেহারা আশাহত করে। ওদের মাল বিক্রি করে তেমন লাভ কোথায়! তার ওপর সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, এই বুঝি কিছু হাতিয়ে নিল। উবু হয়ে বসে দরদাম কর ার ফাঁকে একটা একটা আলু তুলে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। বিশেষ করে বউগুলোকে নিয়ে হয় মুশকিল। উবু হয়ে বসার সময় কাপড়টা মালের ওপর ফেলে দেয়। তারপর কাপড় গোটানোর অছিলায় মালসমেত উঠে দাঁড়িয়ে কেটে পড়ে। চোর ধরলেও মুশকিল। আর কোনোদিন আসবে না। না ধরলে গেল মালটা। ফলে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে নগেন বুঝেছে, যতদূর সম্ভব সতর্ক থাকতে হবে, যাতে চুরির আগেই ধরা যেতে পারে।

লোকটা আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। নগেনের সমস্ত ইন্দ্রিয় বিনা চেষ্টাতেই সজাগ হয়ে ওঠে। কুপির আলোর চারপ াশেযে ছোটো ছোটো পোকাগুলো উড়ছে, সে যেন তাদের মধ্যে একটা বড়ো পোকা মাত্র। ঠিক সেভাবেই চেয়ে থাকে লে াকটার দিকে। হাতে কি বাজারের থলে আছে? ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। মনে হয় যে কী একটা আছে। লোকটা ক্লা ন্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসে তার দিকে। হাতের ব্যাগটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। না, বাজারের ব্যাগ নয়, অফিসব াবুরা যেমন ব্যাগ নিয়ে যায়, সেই ধরনের একটা কিছু হবে বলে অনুমান করে নগেন। কিন্তু লোকটা তার দিকে ফিরেও দেখে না। খুব চিন্তিত ভঙ্গিতে তার পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে যায় তারপর বাঁক ঘুতরে নগেনের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যায়। হতাশ হয় সে। লক্ষ করে কুপির আলোটা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। হয়তো তেল কম। মালতীর তেল নিয়ে অ াসার কথা। অনেকক্ষণ তার আসার সময় পার হয়ে গেছে, সে-ও আসছে না।

ঘুনির বাস যে এত তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দিতে হবে কখনো ভাবেনি নগেন। মাঠ, জমি, চাষবাস, মাছধরা, হাজার ঠাকুরের পুজো দেওয়া এইসব নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে। সে জানত বিপদ কখনো তাকে পেড়ে ফেলতে পারবে না, সে তো হাজরা ঠ াকুরের দোর - ধরা। পৃথিবীর যেখানে যত ভূত - পেতনি আছে, তাদের সকলের রাজা এই হাজরা ঠ াকুর। যে- কোনো সমস্যা ঘরের এক কোণে গিয়ে হাজরা ঠাকুরকে বললেই হল। উনি সব শুনতে পান। বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে দিতে হাজরা ঠাকুরের কোনো জুড়ি নেই। তাই ছেলেমেয়েদের রাতবিরেতে মাঠে যেতে কখনো নিষেধ করত না সে। অমাবস্যার রাত্রিতেও তার ছেলেমেয়ে মাঠে চলে যেত। কখনো সরষের তেল বা এক টুকরো আদার জন্য অর্ধেক মাঠ প

ার হয়ে দিবাকর মান্না বা আতিয়ায় মণ্ডলের বাড়িতে চলে যেত তারা। ভারীভালো ছেলে আতিয়ার। মুসলমানের ছেলে, লেখাপড়া জানে না, গাহমারিনগর পিরবাবার মাজারের কাছে ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিয়মমতো নামাজ - টামাজ পড়ে। মাঝে মাঝে চলে আসে নগেনের কাছে। হিন্দুদের নানা পুজো - আচচা নিয়ে খুব কৌতূহল। নগেনের সঙ্গে সে একব ার হাজরা ঠাকুরের পূজো দেখতে গিয়েছিল পাথরঘাটায় মড়িহাজরার মাঠে, হাজরা ঠাকুর, যাকে বলে কাঁচাখেগো দেবতা একেবারে! তখন মন্দির - টন্দির কিছুই ছিল না। একটা চালাঘরে হাজরা ঠাকুরের ঘট, পাশে থরে থরে মড়ার মাথ া সাজানো। ঘটে ডাব। অন্য কিছু নেই। নীলষষ্ঠীর দিন থেকে শু হয় মেলা। নীলাবতীর সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে হয় ওইদিন। মেলা শেষ হয় বৈশাখের দু-তারিখে। দূর দূর থেকে মানতের পূজো দিতে লোক এসে হাজির হয় ওইদিন। শোনা যায়, সন্ন্যাসী যখন পুজো শু করে কোথা থেকে নাকি একটা কাটা মুণ্ডু এসে নিজের থেকে ঘটের ওপর বসে যায়। ওই ঘট ছাড়া হাজরা ঠাকুরকে তার বড়ো ভয়। বেশির ভাগ লোকেরই তার মতো অবস্থা। পুজো যেখানে হচ্ছে সেখান থেকে অনেকটা দুরে মাঠের এক প্রান্তে রান্নাবান্না চলছে। ওদিকে মন্দিরের পাশেও বড়ো বড়ো হাঁড়িতে ভাত হচ্ছে তো হচ্ছেই। সঙ্গে শে ালমাছ পোড়া। মাঠের মধ্যে একাধিক চাটাই বিছিয়ে সেই ভাত আর শোলমাছপোড়া ঢেলে দেওয়া হয়। পাহাড়ের মতো উঁচু চূড়া হয় ভাতের। রাত নিশুত হলে হাজরা ঠাকুরের আগমন হয়। বুঝতে পারে প্রধান পুরোহিত। তার মারফৎ একটা ঘোষণা বজ্রপাতের মতো নেমে আসে, 'সরে যাও, হাজরা ঠাকুর আসছেন!' এই ঘোষণা প্রবল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে যেন আর যে যেখানে আছে পালায়। তারপর ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে দুরন্ত এক ঘূর্ণি হাওয়া ছুটে আসে আর চাট াইয়ে বিছিয়ে দেওয়া ভাত আর পোড়া শোলমাছ নিমেষে উধাও হয়ে যায়। অথচ মজা হল, এত হাওয়া সত্ত্বেও চাটাই যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়, কিন্তু এককণা ভাতও কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যায় না। চাটাইয়ের তলাকার মাটিই সব অসুখের ওষুধ। মাদুলিকরে সেই মাটি কোমরে পরলে মৃতবৎসার সন্তান হয়, ছেলেমেয়ের হাওয়াবাতাস লাগে না, ভুতে ধরে না --- আপদে বিপদে রক্ষা করেহাজরা ঠাকুর।

নগেন অবশ্য কোনোদিন অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে হাজরা ঠাকুরের আগমন দেখেনি। লোকে বলে সংসারি লে াকেদের ওসব দেখতে নেই। তবে মাটি তার কাছে আছে। ছেলেমেয়েকে মাদুলি করে দিয়েছে সে। আতিয়ারকেও দিয়েছে। মালতী আবার হাজরা ঠাকুরকে মানলেও নগেনের মতো অতটা বাধ্য নয়। সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়ের মতো লক্ষ্মীপুজো করে, সন্ধে দেয়, আবার কোনো কিছু হারিয়ে ফেললে চট করে ঘরের এককোণে গিয়ে বিড়বিড় করে হাজরা ঠাকুরের ক াছে প্রার্থনা করে তার চেলাচামুণ্ডাদের দিয়ে জিনিসটা খুঁজে দিতে। আতিয়ার অবাক হয়ে এইসব পুজো - আচচা, ব ারব্রত, শাঁখের দূর, তেপান্তরে মিলিয়ে যাওয়া - সবই লক্ষ করে আর বলে, 'আমি হিন্দু মেয়ে বিয়ে করব।'

মালতী খিলখিল করে হেসে বলে, 'এ মা, হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলে বুঝি সে তোমার ঘরে গিয়ে শাঁখে ফুঁ দেবে, না বারব্রত, লক্ষ্মীপুজো --এসব করবে? তোমার মা তো তাড়াবে সে বউকে। বউও তো তোমার সঙ্গে মুসলমানই হয়ে যাবে, বোরখা পরবে, তাই না!'

'না, পরবে না!' আতিয়ার যেন বেজায় চটে যায়। বলে, 'পাগলা ছেলে! নে বিড়ি খা! রাত হচ্ছে - মাঠ পার হতে হবে, সে খেয়াল আছে!'

'হাজরা ঠাকুর আছে তো!' হাসে সে।

জবাবে মালতী হাসতে হাসতে বলেছিল, 'যতই করো, তোমার কপাল খারাপ আতিয়ার! আমার বোন থাকলেও না - হয় কথা ছিল ----'

কথাটা পরিহাস করেই বলেছিল মালতী, কিন্তু আতিয়ারের মুখ - চোখ এমন লাল হয়ে উঠেছিল যে, যেন সে দাণ আঘাত পেয়েছে। কথাটা সত্যি হলেই ধরে নিয়েছিল আতিয়ার।

তো অযোধ্যায় মসজিদ ভাঙা নিয়ে যখন দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল প্রায়, সেসময় এই আতিয়ারই ছুটে এসেছিল। ও রাজনীতি, ধর্মনীতি কিছু বোঝে না। ফাঁকা মাঠের মধ্যে নগেন মণ্ডলের বিপদ হতে পারে এটা সে থার্টি - সি ব াসস্টান্ডেকার কার কথায় আঁচ পেয়েছিল। নগেন তার সাহায্য চায় কি না, অথবা কে কী ভাবল এসব নিয়ে -- সেসব ভাব ার অবসর তার ছিল না -- সোজা রাতের বেলা তার কাছে ছুটে এসেছিল একটা চপার হাতে নিয়ে। বলেছিল, 'আমার শরীরে প্রাণ থাকতে কেউ কিছু করতে পারবেনা এ বাড়ির।' অদ্ভুত ছেলে! রোজ রাতে চলে আসত, মাথার তলায় চপার

নিয়ে বারান্দায় শুত। ভোর হলেই চলে যেত।
কুপির আলোটা নিভে নিভে আসছে। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটা দিচ্ছে, তার ওপর তেলও কমে এসেছে। ফলে যতটা না আলো, ধোঁয়া তার চেয়ে বেশি। অনেকক্ষণ আগেই মালতীর তেল নিয়ে আসার কথা। কেন যে এত দেরি করছে কে জানে। আসলে তারও দোষ নেই --- মনে মনে ভাবল নগেন। গত এক সপ্তা ধরে সবজি নিয়ে এখানে বসছে সে। বিক্রির অবস্থা এতই খারাপ এখানে যে, কুপির তেলটুকুও বাড়তি খরচ মনে হচ্ছে এখন। অথচ কদিন আগেই অবস্থা কত অন্যরকম ছিল। দুজনে মিলে কত না স্বপ্ন দেখতে শু করেছিল। স্বপ্নগুলো যেমন রাতের জোনাকির মতো। ভোরের আলো ফুটলে কোথায় সব মিলিয়ে যায়। কত কিছু ভেবেছিল নগেন। একবার তো হ্যাজাক কেনার কথাও ভেবেছিল। ভাগ্যিস কেনেনি। পুরোনো হ্যাজাক কি বিক্রি হত। টবিন রোড-ন' পাড়ায় হ্যাজাক জ্বালানোর খরচ পুষিয়ে গেলেও এখানে তো আর পোষাত না, ঘরে পড়ে পড়ে নষ্ট হত জিনিসটা।
অযোধ্যাপর্ব থিতিয়ে যাবার পর আবার সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল। আতিয়ার তখন আর খুব বেশি আসত না। ভ্যান নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যেত। বিয়ে নিয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে ওর গণ্ডগোল হচ্ছে, এরকম একটা খবর নগেনের কানে আসে। আতিয়ারের সমস্যাটা যে কী, তার মা বা আত্মীয়স্বজনরা চট করে বুঝতে চাইছিল না। আর আতিয়ার মালতী বা নগেনকে যে - কথাটা বলতে পারত সহজেই, বাড়ির লোক বা এমনকী পাড়ার কোনো বন্ধুকেও বলতে পারত না।
মালতী একদিন তাকে বুঝিয়েছিল অনেক করে। 'হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলেও তোমার ঘরে লক্ষ্মীপুজো হবে বা আলপনা দেবে, মাথায় সিঁদুর পরবে--- এসব তোমার পাড়ার লোক, বাড়ির লোক মানবে না গো -- কিছুতেই মানবে না। সেদিন শুনলাম, মেঠোপাড়ারকয়েকটা ছেলে মাঠের ধারে বসে রেডিয়ো শুনছিল, তোমাদের কে এক মোল্লা না মৌলবি, জানি না, এসে ছেলেদের বলে, তোমাদের ধর্মে নাকি গান শোনা গুনা। এমন কথা জন্মে শুনিনি বাপু! অবশ্য মুখ্যু মেয়েমানুষ আমি--- জানি না ঠিক। কিন্তু এই যদি অবস্থা হয় ---'
মালতী একটু থামে। সে আশা করেছিল আতিয়ার কিছু বলবে। কিন্তু ওদিক থেকে কোনো জবাব না পেয়ে মালতী অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে বলেছিল, 'তুমি কি জানো ঠাকুরপো, আমরা যখন এখানে প্রথম আসি --- একদিন সন্ধেবেলায় সন্ধে দিচ্ছি, একজন এসে তোমাদের দাদার সঙ্গে একথা - সেকথা নানা গল্প করে তারপর বললে, বউদি সন্ধে দিন, যত খুশি দিন। কিন্তু আমাদের নামাজের সময়তো। ওইসময় শাঁখটা বাজাতে বারণ করবেন! সেই থেকে কতদিন শাঁখ বাজানো বন্ধ ছিল আমার---'
আতিয়ারের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। বলল, 'কে বলেছিল?'
'থাক, সে নাম তোমার আর জেনে কাজ নেই।'
এরপর ঠিক কী হয়েছিল, মালতী বা নগেন কেউই কিছু জানে না, আতিয়ারের আসা ধীরে ধীরে কমে যায় এখানে। সম্ভবততার বিয়ে নিয়ে একটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল বাড়ির লোকের সঙ্গে। এবং একথাও কানঘুষোয় শুনতে পেয়েছিল নগেন যে, আতিয়ারের এই বাড়িতে আসা নিয়েও লোকে নানা কথা বলছে।
শুধু এখানে আসাই যে কমে গেল তা নয়, আতিয়ার যেন ধীরে ধীরে কেমন পালটে গেল। কথা সে কোনোদিনই খুব বেশি বলত না। এবার সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। ভ্যান নিয়ে গাহমারিনগরের মোড়েও তাকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। কোথায় কোথায় যে ঘোরে, নগেন জানতেও পারে না। কিছুদিন বাসেও কাজ করল। প্রথমে হেলপারি, তারপর বাসে কন্ডাক্টরি করতে দেখা গেল তাকে। কিন্তু বাসের কাজে তার পোষাল না। বড়ো অল্পেতেই রেগে ওঠে আতিয়ার। ফলে বাস কন্ডাক্টরের জীবন সে ঠিক মেনে নিতেপারল না। কিছুদিন আবার পুরোনো লোহা, শিশি - বোতল এইসব কেনাবেচার কাজও করল। কিন্তু সেখানেও তার কীসব অসুবিধে হতে শু করল বলে সেটাও ছেড়ে দিতে হল।
এদিকে অন্য সমস্যা দেখা দিল নগেনের জীবনে। গোলদার একদিন ডেকে পাঠিয়ে নগেনকে খবরটা শোনাল।
এখনও বেশ মনে আছে সে দিনটার কথা। তখন বিকেল। বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসেছিল গোলদার। ধীরে ধীরে কথা বলছিল নগেনের সঙ্গে। প্রথমে দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তা। বাড়ির সকলের খবর নিল গোলদার। কথাবার্তায় সকলের জন্য একটাচাপা উদ্‌বেগ আর বিশেষ করে নগেনের দুটো ছোটো ছেলেমেয়ের জন্য স্নেহের ভাব ফুটে উঠেছিল। ব্যাপারটা কোনদিকে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিল না নগেন। শেষে গোলদার যখন শোনাল কথাটা, নগেনের মনে হল

তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।

'দেখ, আমার কিছু করার নেই। এটা এতই বড়ো ব্যাপার যে, এখানে আমার কথার কানো মূল্য নেই। জমি আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে রাজারহাট টাউনশিপের জন্য। তোরা অন্য ব্যবস্থা দেখ। আমি তো আছি একটা হবে----'

প্রথমে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেনি নগেন। তার চোখের সমানে একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছিল, দিগন্তবিস্তৃত ফাঁকা জমি, ফল তোলা হয়ে গেছে, দূরে একটা দুটো গাছপালা আর দিগন্তরেখা থেকে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। কতদিন মাঠে দাঁড়িয়ে বা দেওয়াল ঘেরা চৌহদ্দিটুকুর মধ্যে দাঁড়িয়ে বা দেওয়াল ঘেরা চৌহদ্দিটুকুর মধ্যে দাঁড়িয়ে, কিংবা কিছু করতে করতে সেই দৃশ্য দেখেছে অবাক হয়ে সে। বর্ষার সময় দূরের চাষিরা যখন বাঁধ দিয়েছে ধুপির বিলে, ঘুনি, জগৎপুর, তালিয়া, চণ্ডীবেড়িয়া, যাত্রাগাছি হাতিয়াড়া --- সব জায়গার মাঠে ডুবে গেছে। সেই জলে রাত হলে ভেসে থাকত চাঁদ। মাছ ধরত তারা চারজনে মিলেই। ছোটোগুলোর বেশি উৎসাহ। পুঁটি, কই, মোরলা, খলসে, চিংড়ি, কাঁকড়া এমনকী টকও হত --- তাই দিয়ে কাঁচালঙ্কা ডলে ভাত --- বাইরে তখন গ্যাঙের গ্যাঙ করেব্যাঙেরা তাদের কেত্তন করেছে। নাগেনের মনে হল, এক নিমিষে কে যেন তার চোখের সামনে থেকে সমস্ত দৃশ্যটাই মুছে দিল।

গোলদারের সহানুভূতি, প্রতিশ্রুতি, কোনোকিছুতেই কাজ হয়নি। ফেরার পথে মাঠের রাস্তায় পা দিয়ে কেঁদে ফেলেছিল নগেন। তবে সে জানত না কান্নার সেই হল শু।

ঘর ছেড়ে সে প্রথমে হাতিয়াড়ার কাছে একটা বাসা ভাড়া নেয়। অ্যাডভান্সের টাকা ছাড়াও গোলদার তাকে একটা ভ্যান কিনে দিয়েছিল, হাতে দিয়েছিল কিছু টাকা। ভ্যানের চাহিদা এখন অনেক কম। এদিকে আগেই যখন অটো ছিল না, অনেক লোক ভ্যানেকরেও চলে যেত। কিন্তু এখন দিন বদলেছে, থার্টি - সি বাস ছাড়াও মিনি আছে, আছে অটো। শুধু মাল বইবার জন্য এত ভ্যান যে, আর বেশির ভাগ ভ্যানেরই পার্টি ঠিক করা আছে। ফলে তেমন সুবিধে করতে পারল না নগেন। আতিয়ারকে যে কিছু বলবে, সে উপায়নেই। সে এখন রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করছে। তার দেখা পাওয়া মুশকিল। অবশ্য ও - কাজে বেজায় খাটনি, সে লাইনে যাবার নগেনের ইচ্ছাও হয়নি কখনো তাছাড়া আতিয়ারের ওপর একটা চাপা অভিমানও ছিল তার।

ভ্যানটা বিক্রি করে দিয়ে একসময় তেলেভাজার একটা দোকান দিয়েছিল নগেন। চলল না তখন সে সবজি বিক্রির কাজ শু করল। কিন্তু বসার জায়গা নিয়ে বেজায় গণ্ডগোল শু হয়ে গেল। হেলাবটতলা বাজারে জায়গা পেল না সে। পুরোনো যারা, তারা সবই একই ইউনিয়ন করে। ইউনিয়ন মানে উটকো কোনো ফড়েকে বসতে না দেওয়ার আর শনিবারে শনিবারে শনিপূজো করা। তোবাজারে বসতে দিল না বলে একটু দূরে সরে যেতে হল নগেনকে। সেখানে বিক্রিবাটা তেমন হয় না।

পরামর্শটা এক ফড়ের কাছ থেকেই পেয়েছিল। সে তার ভ্যানে দিন কয়েক যাতায়াত করেছিল। নগেন তাকে সুখ - দুঃখের কথা বলত। মানুষটাও ভালো। একদিন বলল, 'এভাবে পড়ে পড়ে মার না খেয়ে অন্য কোথাও দেখো না! হাতিয়াড়াতেই যে পড়েথাকতে হবে তার কি মানে আছে? পৃথিবীটা কি একটুখানি জায়গা গো। অনেক বড়ো, যেদিক পানে মন চায় চলে যাও না, কিছু একটা উপায় হবেই। এই আমাকেই দেখো না! আমি কি এখানকার লোক! আদতে বাড়ি দীঘার কাছে রামনগরে। কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে এখানে চলে এসেছি!'

কথাটা মনে ধরেছিল নগেনের। মালতীকে বলতে, সে বলল, 'অচেনা জায়গায় কোথায় আর যাব। তার চেয়ে বরানগরে আমার বোনের কাছে চলো।'

বরানগরে ন-পাড়া রেললাইনের ধারে একটা ঘরও পাওয়া গেল বোন - ভগ্নিপতির দৌলতে। এইভাবে এখানে এসে উঠল ঘুনির সেই ফাঁকা মাঠ থেকে। তারপর এখানে - সেখানে বসতে বসতে টবিন রোডের কাছে একটা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গায়ে সবজি নিয়ে বসা শু করল নগেন। উলটো দিকে একটা ইলেকট্রিকের দোকান, পাশেই বড়ো একটা মুদির দোকান। ওই দুটো দোকানের আলোয় তার আলোর কাজটা ভালোভাবেই চলে যায়। তবু একটা কুপি সঙ্গে রাখতই। কেননা খরিদ্দার এলে তাদের জন্য আলোটা আড়াল পড়ে যেত। তখন ওই কুপির আলোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তেমন কিছু নয়, টুকটাক চলছিল। কিন্তু নগেনের কপাল খুলে গেল বিটি রোডের রাস্তার ধারের বাজারটা ভাঙা পড়তেই। বাজার, বাজারের লাগোয়া যত গাছপালা ছিল সব কেটেকুটে সাফ করে দিতেই নগেন যেশানের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে অ

াসা আলোর সন্ধান পেল। বাজারের কিছু দোকানদারকে অবশ্য ভেতর দিকে স্টল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভাঙাচোরা রাস্তা, বড়ো বড়ো গাছের শহরে, ঢাকনিবিহীন ম্যানহোল পেরিয়ে কেউ আর সেখানে যেতে চায় না। সব যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল নগেনের দোকানে। পরদিন এত তাড়াতাড়ি তার মাল বিক্রি হয়ে গেল যে, নগেন একটু ঘাবড়েই গেল। ইলেকট্রিশিয়ান মধ াদা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'তোর কপাল খুলেগেল রে লগেন। একেই বলে কার সর্বনাশ, কার পৌষমাস। যা যা লরি করে মাল নিয়ে আয়। সব কেটে যাবে। তোর সঙ্গে আমিও লেগে যাব কি না ভাবছি!'

নগেন একা সামলাতে পারে না বলে মালতী এল প্রথমে, পরে তার দুই ছেলেমেয়ে পেলটু আর মিনাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল ওরা। যতটুকু যা পারে। সন্ধে হলেই বাড়ি ফেরতা বাবুরা, বাড়ির গিন্নিরা, কাজের লোকেরা নগেনের দোকানের ওপর অ াক্রমণ চালানোর মতো ছুটে আসে। সকালেও বসত আগে, কিন্তু অত মাল কিনে আনা, সেগুলো গুছিয়ে রাখা -- দু-বেল া ধরে বিক্রি করা -- এসব সম্ভবনয় বলে একবেলাই বসতে আরম্ভ করেছিল।

ভারি সুন্দর চলছিল সব কিছু। নানা স্বপ্ন দেখতে শু করেছিল সে আর মালতী। হ্যাজাক কিনতে হবে একটা। কুপির আলো চলবে না। ছেলেমেয়েদের জামাপ্যান্ট। মালতীর শাড়ি। সে নিজে একটা জবরদস্ত ফুলপ্যান্ট নেবে। তার সারা জীবনের শখ একটা কালো চশমা পরার। গোলদারের ছিল। এবার একটা কালো চশমা কিনে নেবে নগেন। তারপর জায়গা কিনবে রেল লাইনের ওপারে, মাটিকোলে, নয়তো গোরাবাজার বা আরও দূরে যদি যেতে হয় কোথাও, তাই সই।

দূরে গলির মুখে পরপর দু-খানা গাড়ি ঢুকল। নগেনের ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। কিন্তু মাতি দুটো তার সামনে দিয়ে বড়ে ালোকের বাড়ি পোষা কুকুরের মতো চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না তার দিকে। গাড়িগুলো বাঁকের মুখে মিলিয়ে যেতেই রাস্তারদিক থেকে একটা মহিলা হেঁটে আসার আভাস। মালতী হতে পারে কি? নগেন দৃষ্টিটাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু না। পরক্ষণেই বুঝতে পারে অন্য কেউ। মহিলাও চলে গেল। তবে যাবার আগে একবার দাঁড় াল তার দোকানের সামনে। বলল, 'পেঁয়াজ আছে?'

'পেঁয়াজ!' নগেনের ভারি আপশোস পিঁয়াজ নেই বলে। 'পেঁয়াজ তো নেই দিদি। এই ইয়ে --- লেবু আছে, কালো, পুঁইশ াক, কাঁচালঙ্কা, লাউটা দেখুন না -- ভালো লাউ -- ভালো না হলে দাম নেব না।'

মহিলা ভ্রু কুঁচকে নগেনের মালের ওপর একবার চোখ বোলাল। তারপর বলল, 'সকালে ভ্যান রিকশা নিয়ে যে - ছেলেটা আসে, ওর কাছে থেকে নিয়ে নিয়েছি।'

কথা শেষ করে মহিলা হাঁটা দেয়। নগেন আবার গলির মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন এক অনন্ত প্রতীক্ষা। মালতী এলেই বাড়ি ফিরে যাবে সে। কেন যে মালতী আসছে না এখনও, ভাবছে সে এমন সময় উলটো দিক থেকে একটা বেঁটে মে াটা করে লোক এসে দাঁড়াল তার সামনে। নগেন প্রথমে খেয়াল করেনি। মোটা গলায় লোকাটা বলল, 'এই, ক্যাপসিকাম কত করে রে?'

'কুড়ি টাকা বাবু।'

'এই সব শুকনো মাল --- কুড়ি টাকা। কম কর।'

'কতটা নেবেন?'

'দুশো দে।' লোকটা বলে।

নগেন ওজন করার সময় এমন করে যে দুশোর থেকে একটু বেশি হয়ে যায়। বলে, 'আড়াইশো করে দিই বাবু।'

'দে।'

'কাঁচালঙ্কা আর লেবুও দে। লেবু জোড়া কত?'

'তিনটে দু টাকা বাবু।'

লোকটা জিনিস নিয়ে চলে গেল। তারপরই কুপির আলোটার দিকে চোখ পড়ল নগেনের। কতগুলো ছোটো ছোটো পোকা ওড়াউড়ি করছে আলোটার কাছাকাছি। ওরা জানে না, মৃত্যু ওদের কাছে। নগেনের মনে হল, এই আলোর শহর থেকে অনেক দূরে, ঘুনির সেই অন্ধকার মাঠটাই তার কাছে ভালো ছিল। সে বুঝতে পারে না, কিসের এত ভাঙচুর হচ্ছে চারপ াশে। কেনই বা লোককে বেবাক উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার জায়গা থেকে। নানা লোকে নানা কথা বলে আর সে হাঁ করে শোনে। যেমন এর আগে যেখানে বসত, টবিন রোডে, তার রমরমার সময় তখন। মাল সব শেষ করে দোকান গোচাচ্ছে

সে, এমন সময় দুটো লোকের তর্ক হতে দেখেছিল তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে।
দুজনেই বয়স্ক। প্রথমজন লুঙ্গি আর গায়ে একটা মোটা জামা চাপিয়ে ছিল। মুখে কয়েক দিনের না কাটা দাড়ি। দ্বিতীয় জন বয়স্ক হলেও খুব সুন্দর দেখতে। পাঞ্জাবি পরা। পাঞ্জাবির ওপর একটা পুরোনো শাল। প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটাকে বলছিল, 'বাজারটা তুলে দিয়ে জ্যামটা অনেক কমেছে।'
'তা তো কমেছে --- লোকগুলোর কী অবস্থা হয়েছে জানো?'
'কোন লোকগুলোর?'
'বাজারের লোকদের কথা বলছি।'
'সে আর কী করা যাবে। ভালো কাজ করতে গেলে ওরকম একটু - আধটু হবেই। তাছাড়া রাস্তার ওপর বসা তো বেআইনি ---'
এই কথায় দ্বিতীয় লোকটা আচমকা রেগে যায়। বলে, 'এত সহজেই আইনের ব্যাখ্যা করে ফেললেন! একবারও ভেবেছেন কী, এই একই প্রক্রিয়া আপনার ছেলের অফিসেও চালু হতে পারে। যে - প্রক্রিয়ায় রাস্তার ধার থেকে আনাজঅলাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় অফিসে স্টাফ কমানো হচ্ছে। সেই একই প্রক্রিয়ায় জমিজিরেত থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে মানুষ। সেই একই প্রক্রিয়ায় ছোটো ছোটো ব্যাবসাদারেরা হটে যাচ্ছে---'
নগেন কিছুই বুঝতে পারেনি। অনর্থক চেঁচামেচির মতো শব্দগুলো তার কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। শুধু তার মনে হয়েছিল, কোথাও কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে। সে গণ্ডগোলের মধ্যে না জেনে সে-ও জড়িয়ে পড়েছে হয়তে া।
তার ভাবনাটা একেবারে যে মিথ্যে নয়, বোঝা গেল অল্প দিনের মধ্যেই। বড়ো তাড়াতাড়ি সুখের দিন ফুরিয়ে গেল নগেনের।যে বাড়ির তলায় বসত, সেটা একটা প্রমোটারের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। ফলে উঠে যেতে হল নগেনকে। ততদিনে তার দেখাদেখি আরও অনেকে সবজি নিয়ে বসে পড়েছে আশেপাশে। কোথা দিয়ে যে এত গরিব লোক এসে যায়! কথাটা ভেবে নগেন নিজেও অবাক হয়। কিন্তু স গলির মধ্যে তেমন কোনো জায়গা না পেয়ে নগেন সরে যায় একটু দূরে। কিন্তু ততদিনে সে হামলে পড়া ভিড় সত্যিই শেষহয়েছে। একটা বাজার ভাঙাল সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশে যেন অনেক ছোটো ছোটো বাজার গজিয়ে উঠেছে। তাছাড়া আছে ভ্যানঅলাদের চলন্ত বাজার। সে যে ভেবেছিল, এটা কিনবে সেটা করবে --- ভ াবনাগুলো এমন মিলিয়ে গেছে।
ভেবেচিন্তে নগেন টবিন রোডে বসাই ছেড়ে দিল। এই ফাঁকা জায়গাটা সে নিজেই খুঁজে বের করেছিল। এইরকম জায়গা, যেখানে আশেপাশে অন্য কোনো সবজিঅলা নেই, সেখানে বসাই পছন্দ তার। কথাটা মনে হতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।
কুপির আলোর চারপাশ ঘিরে পোকারা ওড়াউড়ি করছে। নগেনের মনে হয়, শুধু সে নয়, মালতী, তাদের বাচচারা, এমনকীআরও সব লোক, যারা তার আশেপাশে আছে, আর হ্যাঁ আতিয়ারও --- সবাই, ওই পোকাগুলোর মতো হয়ে গেছে।
গলির মুখে পর পর কয়েকজনকে আসতে দেখল নগেন। ওদের মধ্যে মধ্যবয়স্ক একজন, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, নগেনের স ামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'রাঙালুগুলো রং করা নাকি গো?'
নগেন লজ্জিত হয়। ঘুনিতে থাকতে রং করা রাঙালুর কথা কখনো শোনেনি। এখানে আনাজ বিক্রি করার সময় প্রথমে রং করা পটল, তারপর ক্যাপসিকাম, লঙ্কা, করলা, আর লাল আলুতে যে রং করা হয়, রং করা জিনিস যে বাজারে ভালো দ ামে বিক্রি হয়, লোকে পছন্দ করে রংচঙে জিনিস --- এসবই সে জানতে পারে। বলে, 'বাবু, রং তো আমরা করি না। শিয় ালদা থেকে নিয়ে আসি, ওরাকী করে কী করে জানব।'
লোকটা উবু হয়ে বসে দরদাম করে রাঙাআলু, কাঁচালঙ্কা, লাউ আর আলু কিনল। দাম মিটিয়ে চলে যাবার পর নগেন একটি বিড়ি ধরায়। আতিয়ারের মুখটা মনে পড়ে তার। ভারি অদ্ভুত ছেলে বটে! ঘুনি ছেড়ে চলে আসার সময় খবর পাঠ ানো সত্ত্বেও দেখা করতে আসেনি। যাদের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতে পাহারা দিয়েছে একদিন, বেবাক ভুলে গেছে ত াদের! অথচ এর কোনো কারণ নেই। তাদের সঙ্গে যে কিছু হয়েছে তাও নয়। যেন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করতে না - পারাটা ত াদের জন্যেই ভেস্তে গিয়েছে। নগেন হাতিয়াড়া ছেড়ে আসার সময় শুনেছিল লাউহাটির ওদিকে কৃষ্ণপুরের একটা মুসলম

ান মেয়েকে নাকি বিয়ে করছে সে। অথচ মহিষবাথানে ধর্মচড়কের মেলায় গিয়ে ধর্মচড়কের পাঁঠা টানাটানি নিয়ে কৃষ্ণপুরের লোকেদের সঙ্গে তার বিরোধ বাধার উপক্রম হয়েছিল। বুদ্ধপূর্ণিমার পরের দিন এই মেলা বসে। মেলায় প্রধান আকর্ষণ এই পাঁঠা টানাটানি। যারা নিজেদের সীমানার দিকে টেনে নিতে পারবে পাঁঠা তাদের। একদিকে মহিষবাথান, মহিষগোষ্ঠী, তালিয়া, কৃষ্ণপুর, জগৎপুর, চণ্ডীরবেড়িয়া, ঘুনি, যাত্রাগাছির পালোয়ানরা, অন্যদিকে বালিগড়ি, যোতভীম, বাঁচুড়িয়া, ধর্মতলা আর নেড়িলির পালোয়ানেরা, পাঁঠা টানাটানিতে হেরে যাবার পর কী করে যেন আতিয়ারের কোমা ম াথায় মনে হয়েছিল, কৃষ্ণপুরের আসগর হোসেনের জনেই হার। ব্যাস, আর যায় কোথায়! মেলার মধ্যেই একটা অনর্থ বা ধিয়ে বসত সে, যদি না নগেন সঙ্গে থাকত। আজ, এতদিন পরে সেসব কথা মনে পড়তে হাসি পেল তার।

বিড়িতে বোজে জোরে কয়েকটা টানা মেরে ফেলে দেয় নগেন। কোথায় মহিষবাথানের ধর্মচড়কে মেলা আর কোথায় এই ডানলপের বড়োলোকদের পাড়া। সব যেন অলীক স্বপ্নের মতো মনে হয়, গোলদারের কথাগুলো হজম করতে কয়েকটা দিন সময় লেগেছিল।। এমন কি হতে পারে নাকি! এই তো, কোথা থেকে সব উচ্ছেদ হবে হাতিয়াড়া, জগৎপুরে, মেঠোপ াড়ায় এসে বসতি করল। ঘুনির দিকেও চলে এসেছে কয়েক ঘর। তো এরাও সব উঠে যাবে! না, না, এটা মনে হয় ঠিক নয় -- গোলদার একটু বাড়িয়ে বলেছে।

হাজরা ঠাকুরকে জানিয়েছিল তারা। এমনকী তালিয়ায় খুব জাগ্রত ঢেলাইচণ্ডীর কাছে গিয়ে মানতও করেছিল মালতী। ফাঁ াকা মাঠের মধ্যে একটা খেজুরগাছ -- এটাই হল ঢেলাইচণ্ডীর থান। মনের বাসনা জানিয়ে একটা ঢিল বেঁধে আসতে হয় গাছের গায়ে। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হল না।

বিড়িটা ফেলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া নগেন। ঘুনি থেকে হাতিয়াড়া, হাতিয়াড়া থেকে হেলাবটতলা, হেলাবটতলা তেকে টবিন রে াড, টবিন রোড থেকে এখানে। নগেন জীবনে কখনো এমন হুড়ুমধাক্কার মধ্যে পড়েনি। ভেবেছিল এবার একটু থিতু হয়ে বসবে। বয়েস তো কম হল না। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। এত দৌড়োদৌড়ির চেয়ে এই শান্ত, নিরিবিলি গলিটাই ভালো। আশেপ াশে বাজার নেই। টুকটুক করে ঠিকই বিক্রিবাটা হবে, বাড়বে আস্তে আস্তে। চলে যাবে তার।

কিন্তু কোথায় কোন দেবতা যেন হাসলেন আর ঘুনির আকাশের কালোমেঘ এখানেও ধেয়ে এল তার দিকে। এখানে বসার দ্বিতীয় দিনেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আতিয়ারের। প্রথম দিন মালা তেমন বিক্রি হয়নি বলে সকাল সকালই চলে এসেছে এখানে। সে আসার কিছুক্ষণ পরে ভ্যান ঠাসা মাল নিয়ে আতিয়ার এসে হাজির।

ওকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল নগেন। 'কী রে তুই? এখানে?'

নগেনের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না আতিয়ারই। আগের থেকে রোগা হয়ে গেছে। চোখ দুটো মাতালের মতো লাল। সারা শরীরে পরিশ্রম আর ক্লান্তির ছাপ। আগে পান - টান খেত না। মনে হয় পানের নেশা ধরেছে। মুখে পানের লাল ছোপ। যেন ঠিক আতিয়ারনয়, আতিয়ারের মতো দেখতে অন্য কেউ।

আতিয়ার শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি! কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

'এই তো দোকান দিয়েছি।'

'শুনেছিলাম গোলদার তোমাদের উঠিয়ে দিয়েছে। ওর জমিও বিক্রি হয়ে গেছে। ওপাশকার পুরো জমি রাজার হাট ট াউনে ঢুকে গেছে---'

হ্যাঁ, তাই করতাম।' আতিয়ার বলল, 'কিন্তু আমা সঙ্গে বলল না। তুমি তো জানো আমি অন্যায় দেখতে পারি না, র াজমিস্ত্রির সঙ্গে একটু কিচাইন হয়ে গেল ---'

'তোর তো আর খবর পাই না। হঠাৎ আসা ছেড়ে দিলি -- তো বউদি তো তোর কথা খুব বলে ---'

এই প্রথম আতিয়ারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সামান্য সময়ের জন্য। বলল, 'বলে! বউদি বলে আমার কথা!'

'হ্যাঁ রে!' নগেন বলে, 'আসবে তো এখানে, হয়তো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ---'

'আজ হবে না।' আতিয়ার বলল, 'আমি তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাল বিক্রি করি না। বেচতে বেচতে আড়িয়াদহ অবধি চলে যাই।' একটু থামে আতিয়ার। কী যেন ভেবে নিয়ে বলে, 'আমি তো এখন ভোজেরহাটের ওদিকে চলে গেছি। চাচা অ ার আমার মায়ের মিলি জমি বিক্রি করে দিল, বলল, পরে গরমেন্ট নাকি নিয়ে নেবে। তারপর কৃষ্ণপুরে গিয়ে একটা মুসলমান মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। সেখান থেকেই মাল নিয়ে আসি---'

‘হাতিয়াড়া ছেড়ে আসার আগে কানাঘুষোয় শুনেছিলাম কথাটা। বিশ্বাস হয়নি! তো সেই ভোজেরহাট থেকে তুই মাল নিয়ে আসিস!’
‘কী করব!’ আতিয়ার বলেছিল, ‘এছাড়া আর উপায়ও নেই। জমি নেই যে চাষ করব লেখাপড়া জানি না, হাতের কাজ জানি না -- অন্য কোনো ব্যবসা করার টাকাও নেই ---’
মাঝপথে তাকে বাধা দিয়ে নগেন বলে, ‘কখন বেরিয়েছিস?’
‘রাত সাড়ে বারোটার সময় বেরিয়েছি।’ আতিয়ার বলল, ‘ছটা নাগাদ পৌঁছে যাই এয়ারপোর্টের কাছে। যা মাল আছে বিকেলের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিছু খেয়ে নিতে সাতটা-আটটার সময় রওনা হয়ে যাব, রাত দুটো নাগাদ পৌঁছে যাব। পরদিন আর বেরোব না। মাল কিনব, দুপুরে ঘুমিয়ে নেব। তারপর রাত বারোটার সময় আবার বেরিয়ে যাব। মোটামুটি এসব এলাকার খরিদ্দার আমার বাঁধা হয়ে গেছে ---’
‘বলিস কী রে!’ নগেন বিস্ময় চাপা দিতে পারে না। এই ভর্তি ভ্যান ঠেলে রাত সাড়ে বারোটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেউ যে সারারাত ভ্যান চালিয়ে এখানে আসার পর আবার সারা দিন সেই ভ্যান নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবজি বিক্রি করতে পারে, এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না তার। বলল, ‘এতটা রাস্তা -- লাউহাটি রোড ধরে আসিস তো?’
‘না। সে পথ বড়ো খারাপ হয়ে গেছে এখন।’ আতিয়ার বলে, ‘একটু ঘুরপথে আসতে হয়।’
‘ঘুরপথ মানে?’
‘এই তো নাগেরবাজার হয়ে এয়ারপোর্ট যাব। এয়ারপোর্ট থেকে রঘুনাথপুরে গিয়ে মেগাসিটির রাস্তা ধরব। সেখান থেকে দমপুর রোডে গিয়ে পড়ব। গেছ তো ওদিকে?’
নগেন হাঁ করে তাকিয়েছিল ওর দিকে। মাথা নেড়ে বলল, ‘হ্যাঁ, তারপর?’
‘তারপর ঝালগাছি মোড়। সেখান থেকে নাউট্রিওয়ান বি ট ধরে পাকাপোল পর্যন্ত যাব। ওখান থেকে বাগজোলা খালে পড়ব। বরাবর খালের পাশ ধরে চার কিলোমিটার গেলেই ছেলেগোয়ালিয়া গ্রাম ---’
‘এত দূরে চলে গেলি কেন রে?’ বড়ো আন্তরিক সুরে নগেন বলে।
‘উপায় কী! বাবা নেই, চাচার কথা অমান্য করতে পারি না। তাছাড়া হাতিয়াড়ায় থাকলে তো না খেয়ে মরতে হত। জমি বিক্রির যা দাম পেয়েছি আমরা, তাই দিয়ে এখানে কোথাও জমিও কিনতে পারতাম না, ব্যবসাও করতে পারতাম না।’
‘রাস্তায় চুরি - ছিনতাইয়ের ভয় নেই রে!’
‘তা আবার নেই! তবে একা তো আসি না। আমরা আসি দল বেঁধে।’
‘দল বেঁধে!’
‘হ্যাঁ, এদিককার অনেক লোক তো ওদিক পানে চলে গেছে। তোমার জাহাঙ্গিরের কথা মনে আছে?’
‘কোন জাহাঙ্গির?’
‘জগৎপুরের। জমি - জিরেত ছিল তোমাদের ওদিকে। চাষ করত ---’
‘হ্যাঁ, হ্যাঁ ---’
‘তো সে-ও তো সব বিক্রিবাটা করে ভোজেরহাটের ওদিকে গিয়ে উঠেছে। আগে চাষি ছিল এখন সবজিওলা হয়েছে। তারাদে মেঠোপাড়ার বিনয়, হা, হারান মণ্ডল, জামাল শেখ --- তারপর জগৎপুরের ওদিকে ---’
‘বলিস কী রে!’
এতদিন শুধু সে নিজের দুঃখটাকেই বড়ো করে দেখেছে, আরও যে কত লোক উচ্ছেদ হয়েছে জমি - জিরেত জীবন থেকে সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা পরিবেশে গিয়ে জীবন শু করতে বাধ্য হয়েছে, তার কোনো হিসেহ নেই। সেসব ভেবে নগেন অবাক হয়ে যায়।
আতিয়ার বলে, ‘শুধু কি ওদিকপানে --- আরও সব কোথায় কোথায় চলে গেছে।’ একটু থেমে যোগ করে ফের, ‘তো আমরাজনা পঁয়ত্রিশ একসঙ্গে মাল নিয়ে আসি, ফিরিও একসঙ্গে।’
নগেন অবাক হয়ে আতিয়ারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। যেন সে কী বলবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আতিয়ার পেলটু আর মিনার খবর নিল মৃদু স্বরে। তারপর নগেনের অবাক চোখের সামনে দিয়ে আতিয়ার খরিদ্দারকে মাল বিক্রি

করতে করতে দূরে দিকে চলে গিয়েছিল। নগেন লক্ষ করে, তাকে এখানে প্রায় সবাই চেনে। বাড়ির ভেতর থেকে মেয়ে-বউরা বেরিয়ে এসে আতিয়ারের কাছে মাল কিনছে। কথা বলছে, আসতে দেরি হল কেন জিজ্ঞেস করছে। যারা কখনো তার কাছ থেকে মাল কেনে না, সেই সব গাড়িওলাবাড়ির লোকেরাও আতিয়ারের কাছ থেকে মাল কিনছে। কী না, দেশি মাল। হাইব্রিড নয়। নানারকম সবজিতে তার ভ্যানটা ঠাসা। এমনকী ঝুলিতে করে দেশি মুরগির ডিমও এনেছে সে।

সেদিন রাত্রিবেলায় খেয়েদেয়ে বাচচারা শুয়ে পড়ার পর নগেন মালতীকে বলল, 'মনে হয় আমাকে যখন দেখে নিয়েছে, গলির ভেতরে আর ঢুকবে না।'

'কেন?'

নগেন সরল বিশ্বাসে বলে, 'কেন কী রে! তোর মনে নেই, সেই গণ্ডগোলের সময় চপার মাথায় নিয়ে রাতে এসে আমাদের বারান্দাতে শুয়ে থাকত। শুয়ে শুয়ে সারারাত মশা মারত ---- মনে নেই তোর?'

মালতী বুঝতে না পেরে বলে, 'তাতে কী?'

এবার বেজায় চটে যায় নগেন। বলে, 'এই জন্যেও বলে মেয়েছেলের বুদ্ধি পোঁদের মধ্যে থাকে! আরে ও আমাদের ভালোবাসে বলেই না অত কষ্ট করত! তা সে সব কি ও ভুলে গেছে ভেবেছিস। তুই যে ও যা সব খেতে ভালোবাসে সেসব রান্না করে কত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতিস ওর জন্যে, এমনকী ও যখন বারান্দায় শুয়ে শুয়ে মশা মারত, মাঝ রাতে উঠেও ঠাকুরপোর খোঁজ নিতিস --- তুই ভাবতিস আমি শালা ঘুমোচ্ছি --- কিন্তু আমি সবই দেখতাম। তা আমি যখন মনে রেখেছি --- ও কি আর ভুলে গেছে ভেবেছিস? তোর নাম করতেই যেভাবে ওর মুখচোখ কেমন হয়ে উঠল একেবারে---' বলে হাসল নগেন।

মালতী রাগল না। বলল, 'আলা, বড়ো ভালো ছেলে গো! মনে হয়, বোন থাকলে সত্যিই ওর সঙ্গে বিয়ে দিতুম।'

ওরা ভেবেছিল যা, ওদের সেই ভাবনার সঙ্গে পরের ঘটনা একেবারেই মিলল না। দেখা গেল আতিয়ার ঠিক আসছে, আর বাজারের হাইব্রিড মাল ছেড়ে দেশি মাল নেবার জন্য লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

দেখে শুনে নগেনের মনে হয়েছে, জায়গাটা ও ভালোই বেছেছে। শুধুমাত্র আতিয়ারই এখানে তার কাঁটা হয়ে গেছে। ওর দেশি মাল নেবার জন্য লোকেরা যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে নগেন অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে।

এরপর আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে নগেনের সঙ্গে। মালতীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে দুবার। কিন্তু আতিয়ার কখনো আর মন খুলে কথা বলেনি। পরিশ্রম, অকারণ অভিমান, তাকে যেন অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে। মালতী বলেছে, 'আহা, ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে গেছে গো। কত দূর ভাবো তো একবার! আর ভ্যানটা দেখেছ! চাকা একেবারে বসে গেছে। তাও এয়ারপোর্ট থেকে বিত্রি করতে করতে আসে। হয়তো আরও অনেক মাল ছিল। কী করে যে অত দূর থেকে ভ্যান টেনে টেনে রাতের অন্ধকারে আসে! শুনেই আমার বয়ে বুক কেঁপে যাচ্ছে। অন্ধকার রাস্তা, রাতবিরেতে...'

কিন্তু এই অন্তর্লীন দরদ ও ভালোবাসা সত্ত্বেও ওরা স্বামী স্ত্রী মনে প্রাণে চাইছিল, আতিয়ার যেন আর কখনো না আসে এই গলির ভেতর। তার তো ভ্যান গাড়ি, সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। নগেন বলেছিল কথাটা মলতীকে। জবাবে মালতী বলেছিল, 'ঠিকই তো। ওর মাল বিত্রি হওয়া নিয়ে কথা। কিন্তু মানুষ কেমন পালটে যায় --- তাই না? অত খেতিস বসতিস আমাদের ঘরে, সব ভুলে গেছে! মাল নিয়ে ঠিক এই গলিতেই ঢোকা চাই ওর!'

'রথতলা বা বেলঘরিয়ার দিকে চ --- জায়গা ঠিকই পেয়ে যাব।'

দিন দুয়েক দোকান মালতীর ওপর ফেলে রেখে জায়গাও দেখে আসে নগেন । আশেপাশে বাজার বা সবজির দোকান নেই। রাতের বেলাতেও বসা যাবে। উলটো দিকে একটা মুদির দোকান আছে, তার আলো ছিটকে এসে ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে।

কথাগুলো ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নগেন। মানুষ কত পালটে যায়। আতিয়ার সব বুঝেও এই গলির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি। যে কারণে ভালোভাবে দ্বিতীয় দিন থেকে কথা বলতেও দাঁড়াত না। তার দিকে একটু হেসে, কখনো তাও নয়, চলে যেত দূরেরদিকে। তার আগেই এই পাড়ার মেয়েরা অবশ্য তাদের বাকি বাজারটা সেরে নিত।

দেখেশুনে মালতী নগেনকে বলল, 'খুব তো বলেছিলে মেয়েছেলের বুদ্ধি পোঁদের মধ্যে থাকে! তা এখন কী মনে হচ্ছে? বলেছি না, সব ভুলে গেছে --- বিয়ে করেছে না!'

নগেন মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, 'তুই থাম দিকিনি! ছেলেটার কষ্টের কথাটা একটু চিন্তা কর --- কত দূর থেকে মাল নিয়ে আসে --- আমাদের আর কী, একটু নাহয় একটু সরে বসব ওর জন্যে---'
সেই নগেনও দুঃখ পায়, গতকাল যখন হঠাৎই আতিয়ার ভ্যান দাঁড় করিয়ে হাসিমুখে বলে, 'কী নগেনদা, কেমন বিক্রিবাটা করছ?' তার বলার ধরনে কেমন একটা ব্যঙ্গের ছায়া দেখতে পায় নগেন। যেন ঠাট্টা করছে তাকে।
'ভালোই।' নগেন প্রশ্নের ধরনটা ঠিক বুঝতে পারেনি।
'জায়গাটা তেমন সুবিধের নয় ---' আতিয়ার বলে, নগেনের মনে হয় আতিয়ার তাকে সরাসরি এখান থেকে চলে যেতেই বলছে বুঝিবা। তেমনটাই ধারণা হল নগেনের।
নগেন কিছু বলার আগেই আতিয়ার আচমকা তার ভ্যানের সামনে ঝোলানো ময়লা থলিটা থেকে কয়েকটা লজেন্স বের করে নগেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পেলটু আর মিনাকে দিয়ো।'
'আবার পয়সা খরচ করে এসব আনতে গেলি কেন রে'
নগেন স্পষ্টত বিরক্ত হয়। কিন্তু আতিয়ার সেসব গায়ে মাখে না। তার ঝুলি থেকে এরপর বেরোয় একটা সস্তা সিগারেটের প্যাকেট। প্যাকেটের ভেতর থেকে একটা সিগারেট বের করে নগেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'নাও ধরো----'
নগেনের মনে হয়, পুরো ব্যাপারটা আতিয়ারের সাজানো। হয় সে ঘুষ দিতে চাইছে, নয়তো তাকে, তার অবস্থাকে ব্যঙ্গ করছে। তবু সে সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে নিল, কিন্তু তখনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, আর নয়, এই কামড়াকামড়ির মধ্যে সে আর থাকবে না।
কুপির আলোটা একটু বেশি রকম দপদপ করছে। নিভে যাবে এবার। তেল ফুরিয়ে আসছে। কথাটা বুঝেই নগেন মালতীর জন্য আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না ভেবে মাল গোছাতে শু করল।
মালতী এল যখন নগেনের মাল তখন সব গোছানো শেষ। মালতীকে দেখে নগেন খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'এত দেরি করলি কেন? জানিস, কাল আরও দূরের দিকে যেতে হবে, সকাল সকাল উঠতে হবে .... একটুও আক্কেল নেই তোর!'
'কী করব, তোমার ছেলে - মেয়ের জন্য রেঁধে খেতে দিয়ে তবে এলাম। খিদেয় ওরা কাঁদছে --- আমি কী করব?'
'এত খিদে কিসের বল তো হারামজদাদাদের --- সব সময় খাই খাই করে!'
মালতী আহত হবার স্বরে বলল, 'ও কথা বোলো না! বিকেলে আগে টিফিন করত ওরা। ক'দিন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। সারাদিন হুটোপাটা করে --- খিদে পাবে না!'
'নে দাঁড়া, ভ্যান ডেকে আনি।'
মালতীকে রেখে নগেন চলে গেল। একটু পরেই মোড়ের মাথা থেকে একটা ভ্যান নিয়ে ফিরে এল।
ভ্যানে মাল তুলতে তুলতে মালতী বলল, 'কাল জায়গাটা ফাঁকা দেখে ও হয়তো খুশিই হবে।'
'উপায় কী! বিয়ে - থা করেছে --- দুদিন পরে ছেলেমেয়েও হবে। আর কষ্টটার কথা একবার চিন্তা কর তো!'
'মুখটা শুকিয়ে চেহারাটা যেন দড়ি পাকিয়ে গেছে ! আমি হলে কখনোই ওকে এভাবে খাটতে দিতাম না!'
'মুখে বলা সহজ রে! কাজে করা অনেক কঠিন। কার কী অবস্থা ভগবানই জানেন।' নগেন বলল।
ভ্যানে মাল তোলা হয়ে গেছিল। মালতী আর নগেন ভ্যানের পেছনে পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর ভ্যানটা চলতে শু করতেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল নগেন। যে - অন্ধকার ওদের গ্রাস করে আছে সেই অন্ধকার চিরে সে বলল, 'বাড়ি গিয়ে একটু চা খাব।'
'এত রাতে চা!' মালতী একটু অবাক হয়।
'তোর হাতের পায়েসপাতা দিয়ে চা খেতে বড়ো ইচ্ছে করছে রে!'
'পায়েসপাতা!' কথাটা এমনভাবে মালতী উচ্চারণ কর যেন ভুলে যাওয়া কোনো পৃথিবীর কথা বলছে। ঘুনিতে তাদের বাসার চারপাশে ছোটো ছোটো পায়েসপাতার গাছ ছিল। বলা চলে পায়েস পাতা গাছের ছোটোখাটো একটা জঙ্গল। চা বসিয়ে এক ছুটে গিয়ে মালতী একটা পাতা ছিঁড়ে একটু ধুয়ে নিয়ে চায়ের মধ্যে ফেলে দিলে অদ্ভুত সোয়াদ হত সেই চায়ের। ভাতের হাঁড়িতে ফেলে দিলে মনে হত পায়েস রান্না হচ্ছে --- এমন একটা সুগন্ধ বেরোত, গন্ধটা ছড়িয়ে যেত মোটা চালের ভাতের মধ্যে। পেলটু আর মিনা হাপুস হুপুস করে সেই মোটা চালের ভাত পাতলা ডাল দিয়ে মেখে খেয়ে নিত।

যেন সত্যিই ওরা পায়েস খাচ্ছে!
অন্ধকারের মধ্যে রিকশাটা চলতে শু করল। স্বামী - স্ত্রীতে মৃদু স্বরে পায়েসপাতা নিয়ে কথা বলতে বলতে সেই অন্ধকারের মধ্যে আরও একটা অন্ধকার মিশে গেল।

পরদিন সকাল হল, দুপুর হল, রাত --- সারাদিন চলে গেল।
তারপর আরও একটা দিন গেল।
আবার সকাল হল, রাত হল, আবার সকাল হল।
দিনের পর দিন চলে গেল। এলাকার লোক অবাক হয়ে দেখল কাঁচাপাকা দাড়িসমেত যে আধবুড়ো লোকটা দেয়ালের গ ায়েবসে আনাজ নিয়ে বিত্রি করত, সেআর আসছে না। অনেকের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ফেরার পথে লোকটার কাছ থেকে টুকটাক কিছুকিনে নেবার। অনেকে আবার বাজার করতে গিয়ে কিছু ভুলে গেলে সেটা ওর কাছে নিয়ে নিত। আশ্চ র্যের ব্যাপার হল, সকালে যে ভ্যানওলা ছেলেটা নিয়ে আসত দূর গ্রামের দেশি টম্যাটো, কপি, লঙ্কা, সার না দেওয়া ল াউ বা পেঁপে; দেশি মুরগি বা হাঁসের ডিম, সেই ভ্যানওলা ছেলেটাও আর আসছে না। কেউ কেউ তাকে দেখেছে গলির সামনে দিয়ে চলে যেতে, কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার হল, গলির মধ্যে সে আর ঢুকছে না কিছুতেই। যেন অদৃশ্য এক লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়েছে কেউ সেখানে। আসছে না তো আসছেই না, কোনোদিনই আরএল না। দুজনের এই না - আসার মধ্যে যে কোথায় গাঁটছড়া বাঁধা আছে ওদের , এলাকার লোকেরা কেউই সেকথা বুঝল না। ওদের শুধু মনে হল, কোটি কোটি লে াকের মধ্যে দুটো আনাজ লোক চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com